THE IMPRESSION, A Journal on Multi-Disciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue 2022 (ISSN: 2278-2699) pp. 97-105, *www.sreechaitanyamahavidyalaya.ac.in*

জীবনের কথামালাঃ তপন বাগচীর কবিতা

ড. পিয়ালি দে মৈত্র*

সারসংক্ষেপ : *দুই বাংলার কবিতাপ্রিয় মানুষের কাছে তপন বাগচী যথেষ্ট পরিচিত নাম। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ এই প্রবন্ধটির আলোচ্য পরিসর। ঢাকার বিভাস প্রকাশনী থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত 'নির্বাচিত ১০০ কবিতা' এবং ২০২০ সালে প্রকাশিত 'নির্বাচিত ২০০ কবিতা' গ্রন্থদুটি বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। একজন কবির একমাত্র পরিচয় বোধহয় তাঁর কবিতার পংক্তিমালাতেই অন্বেষণ করে নিতে হয়। কারণ সেখানেই তাঁর নিভৃত যাপনের ছবিটি আঁকা হয়ে যায়। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ দুটি সেই পরিচয়কেই বহন করছে।*

সূচকশব্দ :

কবি তপন বাগচী - নব্বই দশক - যাত্রাকাহিনি - নদীকাহিনি - গুচ্ছকবিতা - সময়ের শব্দ - হৃদয়ের চাবি - এই শহরে - শুদ্ধ স্রোত - নিভৃত যাপনের ছবি।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়
হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

মূলপ্রবন্ধ :

"আমি তো সুখেই আছি অনন্ত অসুখে" - যে কবির কলম এমন একটি পংক্তির জন্ম দিতে পারে, তাঁর যাপনের মগ্নতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আর সংশয় থাকে না। এমন একজন কবি হলেন গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের কবিদের অন্যতম তপন বাগচী। দুই বাংলার কবিতাপ্রিয় মানুষের কাছে তিনি যথেষ্ট পরিচিত নাম। বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে তাঁর গবেষণা। গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পাঠের বিষয় হলেও সাহিত্য - সৃষ্টির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি নিরন্তর মগ্ন। তবু একজন কবির একমাত্র পরিচয় বোধহয় তাঁর কবিতার পংক্তিমালাতেই অন্বেষণ করে নিতে হয় - কারণ, যেখানেই তাঁর নিভৃত যাপনের ছবিটি আঁকা হয়ে যায়।

আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে বিভাস প্রকাশনী (ঢাকা) থেকে ২০২০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নির্বাচিত ২০০ কবিতা' গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই গ্রন্থটি হাতে আসার আগে বিভাস প্রকাশনী (ঢাকা) থেকেই ২০১০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নির্বাচিত ১০০ কবিতা' গ্রন্থটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। পরবর্তীকালে যখন 'নির্বাচিত ২০০ কবিতা' প্রকাশিত হয়, তখন দেখলাম 'নির্বাচিত ১০০ কবিতা' গ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে রয়েছে। অর্থাৎ, আগের কবিতাগুলির সঙ্গে নতুন কবিতার সংযোজনে দ্বিতীয় গ্রন্থটির প্রকাশ। যাই হোক, তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কবি ফরিদ আহম্মদ দুলাল যর্থাথই বলেছেন - "তপন বাগচীর কবিতায় প্রবেশ করলে পাঠক একদিকে পাবেন সারল্যের স্বাদ, অন্যদিকে পাবেন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সুবাস ; একদিকে পাবেন নির্মানশৈলীর মুন্সিয়ানা, অন্যদিকে পাবেন নাগরিক জীবনের টানা-পোড়েন ; তপন বাগচীর কবিতায় আছে দেশজ প্রেক্ষাপট, আছে বৈশ্বিক সমাবর্তন এবং তপন বাগচীর কবিতায় অনিবার্যভাবে আছে প্রেমানুষঙ্গের কথাও।" একজন কবির চোখে অন্য একজন কবির কবিতার এই মূল্যায়ন প্রমাণ করে কবি হিসেবে তপনবাবুর স্বতন্ত্র অবস্থানটি।

'যাত্রা শুরু, পদধ্বনি বাজে চারিদিকে'

কবির 'যাত্রাকাহিনি' শীর্ষক কবিতামালার তিন নম্বর কবিতার পংক্তি এটি। 'যাত্রাকাহিনি' নামে আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর মোট তেরোটি কবিতা আছে। 'কাহিনি' শীর্ষক কবিতামালার আর একটি ধারা তাঁর 'নদীকাহিনি' শীর্ষক কবিতামালা - যার সংখ্যা চার। 'জীবনের নৈশগাড়ি' নাম দিয়েও একগুচ্ছ কবিতা রচনা করেন তিনি, যার সংখ্যা ছয়। সুতারাং, দেখা যাচ্ছে বিষয়ভিত্তিক গুচ্ছ কবিতা রচনা করতে কবি পছন্দ করেন। 'যাত্রাকাহিনি' - র কবিতাগুলির একটা ধারাবাাহিকতা আছে। প্রতিটি কবিতায় গভীরভাবে সমাজ - পর্যবেক্ষণের ছাপ স্পষ্ট। বক্তব্যের ঋজুতার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে ক্ষোভ উগরে দেন। শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনকারী পতিতার বেদনাকে অনায়াসে চিনে নিতে পারেন তিনি। পাশাপাশি তীব্র ঘৃণা উঠে আসে শুধুমাত্র বিলাসিতার কারণেই বহুভোগী পুরুষের বিরুদ্ধে। তাই 'যাত্রাকাহিনি' কবিতামালায় বারবার খেটে খাওয়া মানুষের সপক্ষে কথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় চিরন্তন জীবন-'যাত্রা'-র কথা-

"যাত্রা সকলেই করে,কেউ ওঠে খোলামঞ্চে হ্যাজাকের নিচে
কেউ খোঁজে কিছুটা আড়াল আর আলোময় আঁধারের জাল
কারো হাতে পানপাত্র সুধারসে মজে থাকে রাতের প্রহর -
মুখস্থ সংলাপে কেউ রাত ভেঙে গড়ে নেয় কুয়াশা-সকাল।" [যাত্রাকাহিনি : পাঁচ]

'যাত্রাকাহিনি : ছয়' পুরোপুরি ভিন্ন স্বাদের কবিতা। গদ্য কবিতার শৈলীতে রচিত। তাই কবিতাটিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে একালের কবি অমলেন্দু বিশ্বাসকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এক আশ্চর্য সমীকরণে - "অমলেন্দুই আমার জীবনের মাইকেল।" 'যাত্রাকাহিনি : দশ' আমাদের উপহার দেয় অসাধারণ পংক্তিমালা -

" বুকের ক্রন্দন ঢেকে দুই চোখে মেখে নিই জলরঙধারা
হাসির গমক বুঝি ঘাই মারে কারো কারো বন্ধ দরজায়
রাতের প্রহর কাঁপে, পেচকের ডাকে নাচে সবুজ পাতারা
হ্যাজাকের নিবু আলো কোন দূরে ডেকে নিয়ে যায় ! "

'নদীকাহিনি' শীর্ষক কবিতামালার প্রতিটি কবিতাই উৎসর্গীকৃত কবিতা। প্রথমটি কবি অঞ্জনা সাহাকে দ্বিতীয়টি কবি হেনরী স্বপনকে, তৃতীয়টি সাংবাদিক মীর সাহিদুল আলমকে এবং চতুর্থটি সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম মন্টুকে। 'নদীকাহিনিঃ দুই' কবিতায় আমরা পাই - "পায়রাকে ভালোবেসে হয়ে যাই উপকূলবাসী - / এমন ইচ্ছের পাখি আলোয় ডানা ঝাপটায় / মরেছি স্বভাবদোষে, বিনার্তকে ছুটি ঘরমুখী / পায়রাকুঞ্জের মায়া মুছে যায় মগ্ন হতাশায়", তখন আমরা পাঠক হিসেবে বুঝতে পারি, আত্মমগ্নতার এমন প্রকাশ কতটা প্রশংসার দাবী রাখে।

গুচ্ছকবিতার আর একটি ধারা 'জীবনের নৈশগাড়ি' শীর্ষক কবিতাগুলি। এই পর্বে আছে মোট ছয়টি কবিতা। জীবনের যে 'নৈশগাড়ি কখনো থামে না', তার অনিবার্য চলমানতার ছবি ফুটে উঠেছে প্রতিটি কবিতায়। যেখানে "সময়ের ফুলখড়ি লেখে ইতিহাস"।

কবি ঠিকই জানেন- "একদিন এইসব পুরনো দলিল/ পুড়ে হবে ভস্মসাৎ ব্যর্থ হাহাকারে"। তবুও একমাত্র কবিই পারেন তাঁর নিজস্ব যাপনকে অবিচলিত রাখতে, কারণ "কবি এই সময়ের সাহসী অর্জুন/বিশাল প্রকৃতি তাঁর উপমার তূণ।" তাই এই পর্বের কবিতাগুলির প্রায় প্রত্যেকটির শেষে থেকে যায় প্রত্যয়ী ঘোষণা। আমরা কয়েকটা কবিতার দিকে চোখ রাখতে পারি -

(ক) জীবনের নৈশগাড়ি কখনো থামে না
অচেনা পথের ভুল তার চিরচেনা [জীবনের নৈশগাড়িঃ এক]

(খ) আমি তো থাকি না বসে অর্থহীন ভেবে
জীবনের নৈশগাড়ি সব তুলে নেবে। [জীবনের নৈশগাড়িঃ দুই]

(গ) বন্দরের বাতিমুখী দীর্ঘ মনোরথ
জীবনের নৈশগাড়ি খুঁজে নেয় পথ। [জীবনের নৈশগাড়িঃ তিন]

(ঘ) কবি নয় মুখাপেক্ষী প্রেমের দয়ার
যদিও রয়েছে হাতে প্রথম পয়ার। [জীবনের নৈশগাড়িঃ চার]

'যাত্রাকাহিনি' পর্যায়ের কবিতা থেকে পরিক্রমা শুরু করলে 'জীবনের নৈশগাড়ি' শীর্ষক কবিতাগুলির এইসব অন্তিম পংক্তিমালায় একটা যেন বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। কবির কলমের সঙ্গে পথ হাঁটা হয় পাঠকেরও। অনায়াস সাবলীলতায় এইসব কবিতা আমাদের পৌঁছে দেয় এক প্রত্যয়ী অনুভবে।

'এই হাতে অস্ত্র ফেলে কলম ধরেছি'

একজন কবির কলমে অনিবার্যভাবেই উঠে আসে সময়ের শব্দ। তপন বাগচীও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর 'জীবিকা' কবিতার পংক্তি দিয়ে এই পর্যায়ের আলোচনার শিরোনাম চিহ্নিত করার একমাত্র কারণ, আলোচ্য কবিতায় একইসঙ্গে কবি উচ্চারণ করেন তাঁর সম-সময়ের কথা এবং নিজের অসহায়তার কথা। অনায়াসে তিনি লিখে ফেলেন - " বাজারে বিকিয়ে মেধা পেট পুরে খাই।" এই আত্মগ্লানির সঙ্গে মিশে থাকে তাঁর দেশপ্রেম, সমাজ-সচেতনতা এবং অবশ্যই প্রতিবাদ। কবি সুমন সরদার তাঁর সম্পর্কে বলেন -

> " তপন বাগচী রাজনীতি ও সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করেন না, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে কাব্যযুদ্ধ করেন সমাজ-ব্যবস্থার তন্তুজালে বন্দি মানুষের পরিত্রাণের এক মায়ামন্ডল সৃজনের জন্যে। খিদে মরা রাতের অসহায় মানুষের জন্যে তিনি সুস্থ সবল রাজনীতি চান, গড়ে তুলতে চান এমন জাল, যে জালের মধ্যে আটকে ফেলবেন ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা। মূলত বামধারার রাজনীতির সাথে তাঁর একসময়ের সম্পৃক্ততা তাঁকে এ ধরনের কবিতা রচনায় তাড়িত করে। তাই তাঁর কবিতায় সমাজ বদলের প্রচ্ছন্ন লড়াই ও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিবাদী স্বর ফুটে ওঠে।"

তপনবাবুর সমাজ-সচেতনতার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে অসংখ্য কবিতায়। বঙ্গ একটি জাতির নাম, শাহবাগ (দুটি কবিতা), ক্ষুধা তেড়ে আসছে, উন্নয়ন-গবেষণা, সাংস্কৃতিক সমীক্ষা, খোলা বাজার, ছুরি, এখানে মানুষ, দধিচীর হাড় চাই, দ্রোহ, এই শহরে, একদিন শান্তি ইত্যাদি। এইসব কবিতায় প্রতিবাদী কলমের রাগ, ঘৃণা, ধিক্কারের প্রাবল্য কবিতাকে করে তুলেছে কিছুটা স্বতন্ত্র। কাব্যময়তার মগ্নতা সেখানে অনুপস্থিত। ফলে কবিতা হয়ে উঠেছে অনেকাংশেই বিবৃতিধর্মী-- স্বাভাবিকভাবেই 'কবিতা' হয়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'উন্নয়ন-গবেষণা' বা 'সাংস্কৃতিক সমীক্ষা' কবিতাদুটির কথা। তুলনায় 'দধিচীর হাড় চাই', 'একদিন শান্তি', 'ক্ষুধা তেড়ে আসছে', 'দ্রোহ', 'ছুরি', অথবা 'খোলা বাজার' অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময়। তীব্র ক্ষোভ সেখানেও আছে - তবু কবিতা হিসেবে সেগুলি ব্যতিক্রমী। সমাজ-সচেতনতার অন্যতম প্রকাশ 'শাহবাগঃ এক' এবং 'শাহবাগঃ দুই' কবিতাদুটি। কবি বলেন -

"কেউ কি হিসেব রাখে কত পাপ রঙের দেয়ালে
কী ছাই লিখেছি আমি সময়ের শুকনো পাতায়
আমাকে ডেকেছে পথ, শাহবাগ, রঙিন খেতাব-" [শাহাবাগঃ এক]

অথবা-

"পথের ধুলোরা ঠিক চিনে নেয় ধুলোমাখা পায়ের পথিক
কোনো কোনো পথ ঠিক এনে দেয়
পথিকের পথের ঠিকানা।" [শাহাবাগঃ দুই]

'বর্ষাপাড়ায় সেরমা সেতাং' কবিতাটি এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়। উচ্চকিত 'স্লোগান' ধর্মী একটি শব্দও না লিখে কবি সেখানে শুধু ঘোষণা করেন - "আমরা শুধু শত শত মানুষের ভেতর / অজস্র আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম।" বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে 'জলবন্টন নীতি' সংক্রান্ত অভিমানের সুরটি ছায়া ফেলে যায় "জল চাই প্রান্তরের কাছে" কবিতায়। কবির সখ্যতার হাত বাড়ানো থাকে অসংখ্য মানুষের দিকে। সেই সখ্যতার সেতু ধরে তিনি পৌঁছে যান মানুষের কাছাকাছি- রচিত হয় এমন অসংখ্য কবিতা, যার প্রতিটি উৎসর্গীকৃত, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা যায় অনায়াসে-

(ক) স্বীকৃতি [প্রকৌশলী সাবিনা হাই উর্বিকে]
(খ) সাম্প্রতিকী [কবি রবীন্দ্র গোপকে]
(গ) তেজী [কবি গোলাম পিবরিয়া পিনুকে]
(ঘ) কবিতা [ছোটন বাগচীকে]
(ঙ) জন্মদিনে [কবি শামসুর রহমানকে]
(চ) শিল্পযাত্রা [কবি মহাদেব সাহাকে]
(ছ) সমান্তর [বাকশিল্পী কামরুল হাসান মন্টুকে]
(জ) চোখ রোদ্দুরের দিকে [কবি আশিস সান্যালকে]
(ঝ) নেবুতলে জোনাকির আলো [কবি ঈশিতা ভাদুড়ীকে]
(ঞ) ভারতবর্ষের কবি [কবি উত্তম দাশকে]
(ট) কবিরা ব্রাক্ষণ হয় [কবি সুবোধ সরকারকে]
(ঠ) মগ্নতার ভাঁজ খুলে [কবি দীপিকা বিশ্বাসকে]
(ড) বেজায় মোহিত [নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে]
(ঢ) জলের ভেতরে ডুব [কবি অরুণেশ ঘোষকে]
(ণ) যশের মন্দিরে [মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মরণে]

তপন বাগচীর কবিতার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে দেশপ্রেমের অনিবার্য সুর। তার অন্যতম প্রমাণ 'বঙ্গ একটি জাতির নাম' এবং 'সকল নদীর নাম গঙ্গা ছিল' কবিতাদুটি। বিশেষ করে দ্বিতীয় কবিতাটি ভারী মায়াময়-

"গঙ্গা থেকে গাঙ
গাঙ মানে পৃথিবীর যে কোন নদীর জলধারা
একদিন সকল নদীর নাম গঙ্গা ছিল শুধু।"

"খুলে দাও কাঠফাটা হৃদয়ের চাবি"

"হৃদয়ের চাবি" যে কবির হাতে থাকে, অনন্ত ভালোবাসার খোঁজে তিনি তো হন্যে হয়ে ঘুরবেনই। তপন বাগচীর কলমের শ্রেষ্ট সম্পদ বোধহয় তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি। 'অনন্ত অসুখে' কবিতাটিতে আছে অভিমানের সুর - "উপহৃত নাম ধরে ডাকব না আর"। 'উপহৃত' শব্দটির অভিনব ব্যবহার পাঠককে চমকিত করে। এই কবিতার আরও একটি অসাধারন পংক্তি মনে গেঁথে যায় - "আমি তো সুখেই আছি অনন্ত অসুখে"। "তৃষিত হৃদয় জুড়ে" কবিতাটিকে অনায়াসে দেশপ্রেমের কবিতা বলা যায়। "তুমি তো" শব্দগুচ্ছের বারংবার ব্যবহার পাঠকের চেতনাকে স্পর্শ করে। প্রতিটি পংক্তিতে একটা শব্দঝংকার তৈরী হচ্ছে। সেইসঙ্গে অনায়াস ছন্দের চলন তো আছেই -

"তুমি তো মায়ের মুখ
সোহাগের নুন মাখা শাসনের টক
তুমি তো মেঘের রঙ
আকাশের গায়ে আঁকা জটিল গমক
তুমি তো ঘরের শোভা
বনগাঁয়ে বেড়ে ওঠা কচি ঠেসমূল
তুমি তো পাখির ডাক
সারাক্ষণ গুণগুণ উদাসী বাউল ..." ইত্যাদি।

"নষ্টের গান" কবিতাটিতেও আছে অভিমানের ছোঁয়া। এই কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে চুঁইয়ে পড়ে অভিমানী আলো আর আলোকিত হয়ে ওঠে এমন সব অনুভব - "কষ্টগুলো দুহাত তুলে ভৈরবী গায়।" একের পর এক কবিতা সেই 'ভৈরবী' সুরের রেশ বহন করে চলে - মনোভৌগোলিক, পরিচয়, সমর্পণ, নৌকাকান্ড, উপচিন্তা, কে আর জানে, ঋণমঙ্গল, ইচ্ছের ভ্রূণ, এইসব স্মৃতির সৌরভ, মুখোমুখি, কোথায় আছি কোন দ্রাঘিমায়, একটি গোলাপ আর....., অপেক্ষায় আছি, বৈকালিক, রাতকাহিনি, বোধঘুড়ি, যদি তুমি না-ই আসো, নিজস্ব আহ্বান, সোনালী অসুখ ইত্যাদি অসংখ্য কবিতাই তার প্রমাণ। 'উপচিন্তা' কবিতাটির নামেই চমক রয়েছে। প্রতিটি পংক্তির শুরুতে 'উ'- কার সম্বলিত শব্দের ব্যবহার বেশ অভিনব -

"উড়কি ধানের মুড়কি ভেজে
উতল হয়ে যতই তুমি ছাওয়ায় বসো
উড়ুক্কু এই বাউড়ি বাতাস আসবে না আর
উড়িয়ে নিতে হাতের থালা।..."

"কোথায় আছি কোন দ্রাঘিমায়" কবিতাটির প্রেমের সুরে মিশে যায় প্রতিবাদের রঙ- "রোজ সকালে আগুন গায়ে মিছিলে যাই" পংক্তিটি একটি ছবি তৈরী করে। সেই ছবিটি পূর্ণতা পায় কবিতার শেষ পংক্তিতে এসে - "আমি এখন মিশে আছি ক্ষুব্ধ সবল জলস্রোতে"। 'যদি তুমি না-ই আসো" শব্দগুচ্ছের ব্যবহার কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। 'বৈকালিক' কবিতাটিতে আছে এক যন্ত্রণাময় আকুলতা। 'বোধঘুড়ি' কবিতায় আসে কালিদাসের 'মেঘদূতম' কাব্যটির অনুসঙ্গ। কিন্তু কবি যখন লেখেন- "আমার বোধিরা হাঁটে আকাশের খোলাপথে সতর্ক চরণে", তখনই কবিতাটি এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়। "নামমাহাত্ম্য : এক" এবং "নামমাহাত্ম্য : দুই" কবিতাদুটির মধ্যে ছন্দ নিয়ে খেলার মধ্যেই এক আপাত সারল্য ধরা পড়েছে। কবি নিজেই ঘোষণা করেন -

"ছন্দ প্রকরণে খুঁজি জীবনের মধ্য-অন্ত্যমিল
সরল গদ্যেও আমি বহমান স্নিগ্ধ সাবলীল।"

"এই শহরে" কবিতাটিতেও ছন্দের ব্যবহার প্রশংসনীয়। কবিতাটির নির্মাণে অনায়াস সারল্যের দক্ষতা মনকে স্পর্শ করে। 'বোধ' কবিতাটিতে ব্যবহৃত 'শিল্পের জরা' (আমাকে তাড়িয়ে ফেরে শিল্পের জরা) অথবা 'প্রণয়ের বীমা' (বাকি থাকে অভিমান, প্রণয়ের বীমা) শব্দগুচ্ছের ব্যবহার অভিনব। তাঁর 'কেতকী ও রাধাচূড়া' কবিতাটির মধ্যে প্রেম ও প্রকৃতির অনুসঙ্গ মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে। কবিতাটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে - 'ক' এবং 'র'। আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি 'কেতকী' প্রসঙ্গ চিহ্নিত হয়েছে 'ক' পর্যায়ে এবং একইভাবে 'রাধাচূড়া' প্রসঙ্গটি চিহ্নিত হয়েছে 'র' পর্যায়ে। 'কেতকী' পর্যায়ে কবি লিখতে পারেন - "গভীর চুলের খাদে শোকের মিনার" অথবা "ধরণীরে ধার দেব অনুনীত অনন্ত শাওন"। 'অনুনীত' শব্দের ব্যবহার প্রশংসার দাবী রাখে। 'রাধাচূড়া' পর্যায়ে আমরা দেখি প্রথম অনুচ্ছেদের নরম প্রাকৃতিক অনুসঙ্গ অনায়াসে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে এক ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। সেখানে লেখা হয় -

"যেখানে অতন্দ্র জেগে সহযোদ্ধা বীর আসলাম
বুকের গভীরে জ্বালে সাহসের শিখা
চারচোখে কাল হবে প্রানবন্ত দৃষ্টি বিনিময়
নির্ভয় কপালে দেব প্রত্যয়ের টিকা।"

আলোচ্য পর্যায়ে শিরোনাম নির্বাচন করা হয়েছে এই কবিতাটিরই 'কেতকী' অংশের শেষ পংক্তিটিকে। সেখানে কবি অনায়াস সাবলীলতায় লিখে ফেলতে পারেন "খুলে দাও কাঠাফাটা হৃদয়ের চাবি।" আসলে, "জীবনের অনিকেত গান" শুরু করতে চান যে কবি, "কাঠাফাটা হৃদয়ের চাবি" তাঁরই মুষ্টিবদ্ধ, প্রতিবাদী হাতেই মানায়। কারণ, কবিই শুধু জানেন - "অঙ্গীকারে মূর্ত হয় প্রাণের স্লোগান"।

"হৃদয়ের রক্তে ফোটে শিল্পের সুষমা"

পৃথিবীর সকল কালের সকল কবির কবিতাতেই আসলে "হৃদয়ের রক্তে ফোটে শিল্পের সুষমা"। তপন বাগচী তাঁর 'কবিতা' নামক কবিতাটিতে সেই চিরকালীন সত্যকেই স্বীকৃতি দেন। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে মিশে থাকে যাপনের উষ্ণতা - সেখানে প্রেম আছে, প্রতিবাদ আছে, সখ্যতা আছে, সময় এবং সমাজচেতনা আছে, আর সবথেকে বেশি আছে জীবনের উত্তাপ। তাই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না "একজন মেহরাব আলী" - র পরিণতি। তিনি প্রশ্ন তোলেন -

"একজন মেহরাব আলী কতকিছু দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন জীবনভর
আজ তাকে দেখতে পাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চনার দায় কে নেবে?"

তাঁর কবিতা সম্পর্কে কবি ও সম্পাদক আনোয়ার কামাল যে মন্তব্য করেন, তা যথার্থ-

"তাঁর কবিতার সুর বাঙালির লোকচেতনায় ভাসমান নৌকা। বিদেশি মতবাদ নয়, দেশীয় কাব্যতত্ত্বই তাঁর অন্বিষ্ট। তাঁর কবিতায় ছন্দ একধরণের অলংকার নিয়ে সমুজ্জ্বল থাকে।"

শুধুমাত্র ছন্দ নয়, আমরা দেখেছি তাঁর বিষয়-নির্বাচন এবং শব্দ ব্যবহারের নিজস্ব ধরণ, দেখেছি অনুভবী মন নিয়ে সময়ের স্রোতে ভেসে চলা সকল বিষয় নিয়ে কথা বলতে। চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে এক গভীর মায়াময় ভালোবাসা আছে বলেই তীব্র প্রতিবাদে বারবার ঝলসে উঠেছে তাঁর কলম। সবথেকে বড়ো কথা, তাঁর কবিতা আমাদের ভাসিয়ে নিতে চায় এক শুদ্ধ স্রোতের অভিমুখে - কবি হিসেবে সেটাই বোধহয় তাঁর দায়বদ্ধতা। কবির একটি অসামান্য কবিতার কয়েকটি পংক্তি দিয়েই আমি আলোচনা শেষ করতে চাই। কারণ, আমার মনে হয়েছে 'শুদ্ধ স্রোত' কবিতার এই পংক্তিগুলিতেই রয়ে গিয়েছে কবির অন্বিষ্ট -

"স্রোতের বিরুদ্ধে একা এই আমি নোঙর তুলেছি
সঙ্গী আছে ছন্দ-হাল, সমকাল, ভাষার লাগাম
আমি তো রুচির হাটে ঘুরে ঘুরে মধুরিমা বেচি
পাটাতনে জমা রাখি পূর্ণোপমা, শুদ্ধমনস্কাম।"

তথ্যসূত্রঃ

১. পরিশিষ্ট, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০, পৃ:- ১৪১।

২. যাত্রাকাহিনিঃ পাঁচ, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ,২০২০, পৃ:- ১০৭।

৩. যাত্রাকাহিনিঃ দশ, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০, পৃ:- ১১১।

৪. জীবনের নৈশগাড়ি, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০, পৃ:- ৬৫- ৬৮।

৫. পরিশিষ্ট, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০, পৃ:- ১৪২।

৬. শাহাবাগঃ এক, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০, পৃ:- ৯১।

৭. শাহাবাগঃ দুই, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০, পৃ:- ৯১।

৮. সকল নদীর নাম গঙ্গা ছিল , নির্বাচিত ১০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ:- ৭৯।

৯. তৃষিত হৃদয় জুড়ে , নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০ পৃ:- ১৪।

১০. উপচিন্তা, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০ পৃ:- ৪৭।

১১. নামমাহাত্ম্য এক ও দুই, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০ পৃ:- ৪৮।

১২. কেতকী ও রাধাচূড়া , নির্বাচিত ১০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ:- ১২।

১৩. একজন মেহরাব আলী, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০ পৃ:- ৯৫।

১৪. পরিশিষ্ট, নির্বাচিত ২০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০২০ পৃ:- ১৪২।

১৫. শুদ্ধস্রোত, নির্বাচিত ১০০ কবিতা, তপন বাগচী, বিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ:- ৪১।